Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 211 - 223
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘দেবী’ : উনিশ শতকীয় বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্বপ্নের উপস্থাপনের একটি বিশ্লেষণ

ড. বরুন নাহা
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজ
Email ID: nahabarun1986@gmail.com
0009-0008-4526-4030

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Dream, Culture, Representation, Reception, Class, Supernatural, Psychology, Freud, Hegemony, Feminism, Postcolonial.

Abstract

Thoughts and studies about dreams have been a concern in almost every culture, regional, national or international, in almost every nation. In Bengali culture also, dreams have undergone various levels of discussions since the inception of this culture. Until the publication and popularity of Freud's ground-breaking book The Interpretation of Dreams in 1900, Bengali literature, starting from our epics, has incorporated dreams, especially the prophetic ones. Previously dreams were chiefly taken as mediums of divine beings to send messages about morality or future events to the mortals on the earth. This was largely the same in British literature and culture as well until Freud published his study on dreams. Some pro-psychological studies about dreams had been initiated in Britain from the beginning of the nineteenth century, growing towards its end, ultimately culminating in Freud's book. But such psychological studies about human minds and dreams were yet to appear in the British India even in the beginning of the twentieth century. Therefore, the superstitious, irrational and prophetic dreams encompassed Bengali literature and culture, canonical or popular. In this context, this article makes a study of Prabhat kumar Mukhopadhyay's story, 'Debi' ('The Goddess'), which makes a use of the cultural practice of divine dreams. The story was published around the same time of Freud's observations on dreams and became famous after Satyajit Ray had adapted it into a film in 1960. This paper intends to investigate Prabhat kumar's representation of such a dream in this story and its reception by the characters, both upper class and lower class. It also makes a query, from the feminist angle, of how the characters, both male and female, receive the divine aspect of dreams and react to this. By doing this, this paper attempts to observe Prabhat kumar's approach to prophetic or supernatural dreams and thereby note whether there is any representational differences between a Bengali writer's approach to dreams and that of the British literary masters around the same time. Finally, this paper seeks to see, with respect to Prabhat kumar's stance on dreams, whether British literature *holds its crown of being an iconic tool of their cultural hegemony over colonies, as the colonial masters had claimed to be.*

Discussion

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে স্বপ্নাদেশ বা স্বপ্নের মধ্যে দৈব আদেশ একটি অতি প্রাচীন প্রথা। শুধু ভারতবর্ষে নয়, এই প্রথা অন্যান্য দেশের বা ধর্মের একটি অঙ্গ হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে সেই দেশের সংস্কৃতিতে এবং তাদের পৌরাণিক বা ধর্মগ্রন্থে। বাইবেলে স্বপ্নাদেশের প্রভূত উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের দেশের পুরাণে বা মহাকাব্যগুলিতে স্বপ্নের দৈবিক আখ্যান লক্ষণীয়ভাবে বর্তমান যা ভারতবর্ষের বহুমাত্রিক এবং বহুভাষিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও তৎজনিত ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের পরেও বাংলার জনমানসে ও সমাজজীবনে স্বপ্ন দৈবিক আদেশের মাধ্যম বা প্রতিফলন হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য ইংরেজি সাহিত্য বা সংস্কৃতিও যে খুব একটা এগিয়ে ছিল, এমনটা পরিলক্ষিত হয়না। বরং স্বপ্নের দর্শন বা প্রতিফলনের সামগ্রিক বিচারে দেখা যাবে হয়তো ইংরেজি সাহিত্য বা সংস্কৃতি কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যের থেকেও পিছিয়ে ছিল, যা কখনো সেইভাবে সামনে আসেনি বা সমালোচিত হয়নি। উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য স্বপ্নদর্শনের একটি তুলনামূলক ও লিঙ্গভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলা সমাজজীবনে স্বপ্নভাবনা ও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাকে উপস্থাপনের আঙ্গিকে বিচার করে এই প্রবন্ধ সেই অনুচ্চারিত ভাবনার উচ্চারণের একটি প্রচেষ্টা করেছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, অস্ট্রিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুণ্ড ফ্রয়েড প্রথমবার প্রমাণসহ তাঁর যুগান্তকারী বই, ‘The Interpretation of Dreams’ (১৯০০ খ্রি:)-এ স্বপ্নকে মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যেও, বিশেষত উনিশ শতকের ভিক্টরীয় সাহিত্যে, স্বপ্নকে মূলত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রূপায়িত করা হয়েছে – দৈবিক বা ধর্মীয় এবং তৎকালীন বৈজ্ঞানিক বা ‘মেডিক্যাল’। স্বপ্নের ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি হল স্বপ্নের একটি অর্থ আছে এবং এই স্বপ্ন হল ঈশ্বর বা শয়তানের বার্তা পাঠানোর মাধ্যম এবং সেই অর্থে স্বপ্নকে মানুষের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনার দিকনির্দেশক হিসেবেও দেখা হতো। স্বপ্নের আরেকটি ব্যাখ্যা, যেটি উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক ও ‘মেডিক্যাল’ গ্রন্থে আলোচিত, তা হল স্বপ্ন একেবারে অর্থহীন এবং এটি ঘটে মানুষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বিকার, যেমন পেট খারাপ, বদহজম, খালি পেটে থাকা, এমনকি মেয়েদের রজঃস্রাব, ইত্যাদির কারণে –

> “A disordered state of the stomach and liver will often produce dreams.”[১]

স্বপ্নকে মানুষের দুর্বল মনের ও বিকারগ্রস্থ চিত্তের প্রকাশ হিসেবেও দ্যাখা হত, অর্থাৎ স্বপ্ন দেখাকে উন্মাদগ্রস্ততার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হত। স্বপ্নের এরূপ তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলস্বরূপ ইংল্যন্ডের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্বপ্ন দেখা বা স্বপ্ন নিয়ে চর্চা করাটাকে অত্যন্ত নীচু নজরে দেখতো। শুধু তাই নয়, বরং বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের সমস্ত পুরুষেরা স্বপ্ন দেখার বাস্তব ঘটনাকেই জনসমক্ষে আস্বীকার করতে থাকে। ফলতঃ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্বপ্নকে, যেটি একটি দুর্বল মনের কার্যকলাপ বলে তাঁরা মনে করল, তাকে দাগিয়ে দিল একটি মেয়েলি, নিরর্থক, কুসংস্কারচ্ছন্ন এবং রোগগ্রস্ত একটি কার্যকলাপ হিসাবে।

অন্যদিকে, ইংল্যান্ডে ভিক্টোরীয় যুগের সমস্ত শ্রেণির নারীরা স্বপ্নের প্রথম ব্যাখ্যা, অর্থাৎ দৈবস্বপ্ন বা (prophetic dream) কে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাকে ব্যবহার করতে থাকলেন পুরুষতান্ত্রিক যৌক্তিকতাকে খন্ডন করে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচায়ক হিসেবে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার মধ্যে একটি লিঙ্গ ভিত্তিক দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা ইংল্যান্ডে উনিশ শতকের শেষের দিকেও ভীষণভাবেই প্রকট ছিল। পুরুষরা যখন স্বপ্নের যৌক্তিক বা তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদের নারী জাতির থেকে উন্নত হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চাইলেন, নারীরা স্বপ্নের অযৌক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক ব্যাখাতেই আরো বেশি করে অটুট থাকলেন নিজেদের আধ্যাত্মিকভাবে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে। এই নারীদের মতে, একমাত্র তাঁরাই আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক জগতের মাধ্যম হতে পারেন, কারণ হল তাঁদের নারীশক্তি। এই কারণেই উনিশ শতকীয় যে সমস্ত পারলৌকিক চর্চার প্রচলন ছিল, যেমন সম্মোহন (hypnotism), বশীকরন

(mesmerism), ‘প্ল্যানচেট’ ইত্যাদি, সেগুলিতে একমাত্র নারীদেরকেই আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সংযোগমাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হতো। Vanessa Dickerson এই বিষয়ে লিখছেন -

> “Women who more easily entered into mesmerism and spiritualism were regarded as being more open to “higher truths” than men; they were hailed for being more open to spiritual knowledge. The angel in the house could be a powerful conduit for the spirituality, the mystery, and the supernaturalism that the age craved but science discredited.”[২]

এই সংস্কারেরই অন্যতম আরেকটি দিক হল স্বপ্ন যার মাধ্যমে ইংরেজ নারীরা, বিশেষত অবিবাহিত নারীরা, পরজগতের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে পারতেন বলে মনে করা হত যা অনেকটা তাঁদের দৈবিক অবস্থান বা মর্যাদার ইঙ্গিত দেয়। Anna Brecke লিখছেন -

> “In supernatural domestic fiction, female characters often act as conduits by creating an opportunity for spirits or prophetic dreams to enter home-spaces.”[৩]

Brecke আরো লিখছেন -

> “The conditions of femaleness, a less developed intellect and a passive body, allow her to be the conduit through which the prophetic dream is introduced into the house, setting the events of the dream in motion... In each case the presence of a new female body acting as a conduit disrupts a functioning homespace.”[৪]

ফলত, স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পুরুষতান্ত্রিক যৌক্তিকতার দাপট সত্ত্বেও এবং স্বপ্ন-দেখা নারীদের পাগল প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও ইংরেজ নারীরা স্বপ্নকে এবং তার অতিপ্রাকৃতিক তাৎপর্যকে ব্যবহার করতে থাকলেন নারীবাদের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসাবে। ফলশ্রুতি হিসেবে, সেই সময় ইংল্যান্ডের নারীদের মধ্যে স্বপ্নের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। তার সাথে উদ্ভব হয় স্বপ্ন-পুস্তিকা (dream books) নামক সস্তার এক পথপুস্তিকার (street book) যা তাদের লোকসংস্কৃতির (popular culture) এক অত্যন্ত জনপ্রিয় অঙ্গ হয়ে ওঠে। লক্ষণীয়ভাবে, অধিকাংশ সময়েই এই সমস্ত স্বপ্ন-পুস্তিকার লেখক ছিলেন পুরুষেরা, যাঁরা Mother Bunch, Mother Bridget, Mother Shipton এই জাতীয় কিছু নাম দিয়ে বইগুলি প্রকাশ করতেন যার বাজার মূল্য ছিল অনেক বেশি। কারণ নারীরাও তখন পাঠিকা হিসাবে উদ্ভূত হচ্ছেন অনেক বেশি মাত্রায় এবং এই জাতীয় পুস্তক পুস্তিকা ছিল তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। কারণ এই স্বপ্ন পুস্তিকা গুলিতে স্বপ্নে দেখা বিভিন্ন ঘটনা বা জিনিসকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হত নারীদের জীবনের বিশেষত তাঁদের সম্পর্ক, বিবাহ ও সন্তান বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে স্বপ্নের দৈবিক ব্যাখ্যা ও তার উপস্থাপনের এই প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দৈবিক স্বপ্নের উপস্থাপনা বা প্রতিফলন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই তুলনামুলক পর্যালোচনায় উনিশ শতকের ছোটগল্পকার ও রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের, যিনি বাংলার মাপাসাঁ নামে পরিচিত, ছোটগল্প ‘দেবী’ এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। লক্ষণীয় বিষয় হল, ফ্রয়েডের প্রকাশিত স্বপ্ন বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থটির ও প্রভাতের গল্প ‘দেবী’র প্রকাশ কাল সমসাময়িক। ‘দেবী’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ খ্রিঃ) ‘ভারতী’ পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় যা সেই বছরেই সংকলিত হয় প্রভাতকুমারের প্রথম গল্প সংকলন ‘নবকথা’য়। প্রভাতকুমারের এই গল্পের আলোচনা শুধু এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয় যে এটি ফ্রয়েডের গ্রন্থের সমসাময়িক। বরং এই গল্পটি ফ্রয়েডের মতোই স্বপ্নের কুসংস্কারচ্ছন্ন দিকটিকে আস্বীকার করেছে। কিন্তু ফ্রয়েড যেখানে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বপ্নের মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে স্বপ্নের দৈবিক বা ভবিষ্যৎ দর্শনের ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করেছেন, প্রভাতকুমারের গল্পে সেইরূপ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা না থাকলেও তিনিও দৈবস্বপ্ন বা স্বপ্নাদেশের সংস্কারকে খণ্ডন করেছেন যা সেই সময়ের বাংলা সমাজে ও বাঙালি সংস্কৃতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও প্রকট ছিল। তাই ‘দেবী’ গল্পে তাঁর দৈবিক স্বপ্নের উপস্থাপনা ফ্রয়েডের মতো যুগান্তকারী না হলেও বাঙালি জাতি বা সংস্কৃতির জন্যে পথপ্রদর্শক ছিল, এমনটা বলাই যায়। ‘দেবী’ গল্পে প্রভাতকুমারের দৈবিক স্বপ্নের প্রতিফলন যে শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বা ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতিবাদের দিক থেকে অনন্য বা নজিরবিহীন এবং ফ্রয়েডের মতোই প্রগতিশীল বা

পথপ্রদর্শক তাই নয়, স্বপ্নের এই উপস্থাপনায় নারী পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের দিক থেকেও এই গল্পটি সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে এবং মুক্ত চিন্তার পরিচায়ক। এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সেটাই।

গল্পটির রচনাকাল ১৮৯৯ বা ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ – উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ বা বিংশ শতাব্দীর একদম গোড়ায়। গল্পের পটভূমির সময়কাল তারও আনুমানিক একশত বছর আগে। প্রভাতকুমার গল্পের প্রথমেই ঘটনার সময়কাল উল্লেখ করেছেন, -

> “সে আজ কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের কথা।”[৫]

অর্থাৎ, ঘটনার সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর শুরু; যে সময় ভারতবর্ষে ব্রিটেন তাদের রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রভুত্বের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বও কায়েম করতে শুরু করেছে। সেই সময় বাংলার সমাজজীবন ও লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন দিক থেকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। অনেক সময় তার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলার সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যই সেই প্রতিফলনের উজ্জ্বল দলিল। এমতবস্থায়, মানুষের স্বপ্ন এবং তার তাৎপর্যের প্রতিফলনেও এর অন্যথা হয়নি। স্বপ্নের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তখন বাঙালির কাছে ছিল দূরকল্প। শুধু বাংলায় কেন, মানব মনের তথা স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পাশ্চাত্যেও তখন সময়ের গর্ভে। বাঙালির জনমানস স্বপ্ন নিয়ে খুব একটা ভাবিত ছিল না বা থাকলেও তার ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল মূলত দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে। এক, লোকায়ত বা প্রচলিত বা জনপ্রিয় এবং দৈবিক। স্বপ্নের প্রচলিত ধারণার কোনো সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক দলিল না থাকলেও সেই ধারণা যে আগে প্রকটভাবে ছিল তা বোঝা যায় যখন আজকের দিনেও মানুষের আলাপ আলোচনায় সেরকম কিছু ব্যাখ্যা উঠে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে – ভোরবেলার স্বপ্ন সত্যি হওয়া, সাপের স্বপ্ন দেখলে সন্তানলাভের সম্ভাবনা, ইত্যাদি। অন্যদিকে, বাংলা সাহিত্যের গোড়ার কাব্যগুলিতে, বিশেষত বিভিন্ন মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্য ও পুরাণে, স্বপ্নের দৈবিক সত্ত্বা প্রকটভাবে বিরাজমান। এই সময়ের বাঙালির স্বপ্ন-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে প্রভাতকুমারের ‘দেবী’ গল্প স্বপ্ন রূপায়নের এক অন্য ছবির কথা বলে।

‘দেবী’ গল্পটি এক অসহায় নারীর মানবী থেকে দেবীত্বে উত্তরণের করুণ কাহিণি। গ্রামের জমিদার কালীকিঙ্কর রায়ের আপাতভাবে সুখী এক পরিবার। তাঁর পরিবারে দুই পুত্র সন্তান - তারাপ্রসাদ ও উমাপ্রসাদ, দুই পুত্রবধু - হরসুন্দরী ও দয়াময়ী, এবং এক পৌত্র, খোকা, তারাপ্রসাদ ও হরসুন্দরীর পুত্র সন্তান। আপাত সুখী ভাবার কারণ এই যে জমিদার পরিবারটি আদ্যপান্ত পুরুষতান্ত্রিক যেখানে পরিবারের মেয়েদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জিত অবজ্ঞায়িত। কালীকিঙ্করের প্রতাপ শুধু পরিবারেই সীমাবদ্ধ নয়, তা সমস্ত গ্রামেই বিদ্যমান। কারণ তিনি একাধারে জমিদার এবং অন্যদিকে অত্যন্ত ধার্মিক এক মানুষ যাঁকে গ্রামের মানুষ সিদ্ধ পুরুষ আখ্যা দিয়েছে। প্রভাতকুমার গল্পের প্রথমেই সেটি ব্যক্ত করেছেন –

> “উমাপ্রসাদের পিতা পরম পণ্ডিত, পরম ধার্মিক নিষ্ঠাবান শাক্ত-উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নেই। অনেকের বিশ্বাস উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্করের রায় মহাশয় একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ। আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামের আবালবৃদ্ধ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।”[৬]

অর্থাৎ গল্পের শুরুতে দেখা যাচ্ছে গ্রামের সবার কাছে কালীকিঙ্করের মতবাদ প্রবাদে পরিণত এবং তাঁর কথা সবার কাছে শিরোধার্য। তাই তাঁর পক্ষে কাউকে মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে বা দেবীত্বে বা উল্টোটা প্রতিপন্ন করা নিতান্তই সহজ সরল যার পরিণামে সুখ পর্যবসিত হয় দুঃখে, জীবন মৃত্যুতে এবং কমেডি ট্রাজেডিতে।

এরকম প্রতাপশালী কালীকিঙ্করের কাছেও মানুষ কে দেবীরূপে প্রতিপন্ন করা খুব সহজ ছিল না। কারণ তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি জানতেন যে গ্রামের বিশ্বাস সহজলভ্য হলেও তা প্রমাণের অপেক্ষা করে। বিশেষ করে যখন কাউকে দেবতা বা দেবী হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়। সেইজন্য, ছোট পুত্রবধূ দয়াময়ীকে দেবী হিসেবে প্রচার করতে তাঁর পাঁচ থেকে ছয় বছর লেগে যায় যা উমাপ্রসাদ ও দয়াময়ীর বিবাহের বয়স। বাঙালি ধর্মীয় সংস্কৃতিতে দেবত্ব আরোপ বা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বপ্নাদেশ যে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, সহজ এবং প্রভাবশালী মাধ্যম তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। আর তাঁর মতো ধর্মপ্রাণ ও ক্ষমতাবান জমিদারের পক্ষে স্বপ্নাদেশ কে মাধ্যম করে দেবত্ব আরোপ করা এবং তাঁর পরিবারের, বিশেষত তাঁর নিজের, মহিমা গ্রামের মানুষের কাছে আরও সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা খুব কঠিন কাজ ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তিনি যে সত্যি সত্যিই মা কালীর আশীর্বাদধন্য সেটাকে প্রমাণ করে নিজের ব্রাহ্মণ্য সত্বা ও দৈব চরিত্র, যে হিসাবে

গ্রামের মানুষ তাঁকে জানে এবং মানে, তা বৃদ্ধি করা। আর সেই উদ্দেশ্যের উপায় হিসাবে স্বপ্নাদেশ ছিল তাঁর কাছে একটি মোক্ষম অস্ত্র।

লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রভাতকুমার তাঁর গল্পে এই স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার যখন কালীকিঙ্কর এই স্বপ্নাদেশের কথা তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূকে জানাতে আসেন অত্যন্ত ভোরে –

> “মা জগন্ময়ী কৃপা করে ছোটবউমার মূর্তিতে আমার কাছে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন। **গত** রজনীতে স্বপ্নযোগে আমি এই প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হল।”[৭]

স্বপ্নের উল্লেখ মাত্র একবার থাকলেও এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। প্রকৃতপক্ষে, গোটা গল্পের আখ্যান এই স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই। মূলত, কালীকিঙ্করের এই স্বপ্নের কারণেই গল্পে তথা তার পরিবারের আপাত সুখে এক ট্রাজিক মোড় আসে। তাই একবার উল্লিখিত হলেও এই দৈবিক স্বপ্নের গুরুত্ব আপরিসীম। কারণ এই স্বপ্নের জন্যই কালীকিঙ্করের ধর্মীয় বিশ্বাস একটি গোঁড়া, বদ্ধমূল সংস্কারের রূপ নেয়, যা গ্রাম বাংলার সামগ্রিক সংস্কারের, বলা ভালো কুসংস্কারের, একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। দৈবস্বপ্নের ব্যাপারে গ্রাম বাংলার মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও বদ্ধমূল ধারণার প্রতিফলন ঘটে যখন গল্পের লেখক-বক্তা কালীকিঙ্করের স্বপ্নের ওপর গ্রামের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর বারংবার আলোকপাত করেন –

- পূর্বোক্ত ঘটনার পর তিনদিন অতিবাহিত হইয়াছে; এই দিবসত্রয়ে এ সংবাদ বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশে পাশের বহু গ্রাম হইতে বহুজন আসিয়া প্রসিদ্ধ শাক্ত জমিদার কালীকিংকর রায়ের বাটীতে দয়াময়ী-রূপিনী আদ্যাশক্তিকে দর্শন করিয়া গিয়াছে।[৮]
- দয়াময়ীর দেবীত্ব আবিষ্কারের সংবাদ যত না শীঘ্র চৌদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কৃপায় মুমূর্ষু শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ অতি সত্ত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল।[৯]

এমনকি গ্রামের কবিরাজ মহাশয়ও কালীকিঙ্করের স্বপ্নাদেশে দয়ামযীর দেবীত্বকে আস্বীকার করতে তো পারেনই না, বরং তিনিও সকলের মতোই তাতেই বিশ্বাসী। হরসুন্দরী যখন খোকার চিকিৎসার জন্য কবিরাজের কাছে ঝিকে ওষুধ আনতে পাঠায়, -

> “কবিরাজ মহাশয় এ প্রস্তাব শুনিয়া দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন – ‘মা ঠাকরুনকে বলিস, যখন স্বয়ং শক্তি বলেছেন তিনিই খোকাকে আরোগ্য করে দেবেন, তখন আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে আপরাধী হতে পারব না’।”[১০]

প্রভাতকুমারের ‘দেবী’ গল্পটি গ্রামবাংলার এই সামগ্রিক অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ।

প্রভাতকুমার এই প্রতিবাদ শানিয়েছেন শুধুমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে একটি পরিবারের বিয়োগান্তক পরিণতির মাধ্যমে নয়, বরং আরো এক অভিনব উপায়ে - দৈবিক স্বপ্নাদেশকে গ্রহণ ও বর্জন বা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। কালীকিঙ্কর প্রথম তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা প্রকাশ করেন উমাপ্রসাদ ও দয়ামযীর কাছে। তারপর এই স্বপ্নাদেশের খবর সেই গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি এবং সকলেই সেই স্বপ্নাদেশে ঘোরতর বিশ্বাসী। অথচ তখনও দয়ামযীর দেবীত্বের কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোনো মৃতপ্রায় শিশু বা প্রসবযন্ত্রণায় কাতর কোনো প্রসূতি দেবীর চরণামৃত পান করে আরোগ্য লাভ করেনি তখনও। গ্রামের মানুষের নির্বিচারে বিশ্বাসের মূল কারণ হল এই স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন গ্রামের জমিদার যিনি প্রভূত ক্ষমতাধারী এবং তার সাথে শক্তির একনিষ্ঠ উপাসক। এটিই যথেষ্ট ছিল গ্রামের মানুষের কাছে এবং দুটি ঘটনায় দয়ামযীর দেবীত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর সেই বিশ্বাস গভীর আস্থায় ও বদ্ধমূল গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়।

কিন্তু জমিদার কালীকিঙ্কর রায়ের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই স্বপ্নের প্রতিক্রিয়ার ছবি কিছুটা আলাদা। তাঁর বড় ছেলে তারাপ্রসাদ তার বাবার সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের তথা স্বপ্নাদেশের কোন প্রতিবাদ তো করেই নি বরং সেগুলিকে

বারংবার মান্যতা দিয়েছে। এমনকি তার ছেলে খোকার অসুস্থতা বৃদ্ধির পরেও এবং স্ত্রী হরসুন্দরীর বদ্যি ডাকতে বারংবার মিনতি সত্বেও পিতৃভক্ত তারাপ্রসাদ তার বিশ্বাসে আটুট থেকেছে –

> “তারাপ্রসাস অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পিতার বিশ্বাস, মাতার বিধান, এ সমস্ত তিনি বেদের মত মান্য করেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন – “খবরদার ও কথা বোলো না; ছেলের আকল্যাণ হবে। মা যা করবেন তাই হবে।”[১১]

এমনকি দয়াময়ীও যখন কালীকিঙ্করকে বলে যে বদ্যি ডাকার প্রয়োজন নেই, -

> “আমিই ওকে ভালো করে দেব,” তখন কালীকিঙ্করের সাথে “তারাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হইলেন।”[১২]

দয়াময়ীর দেবীত্বে তারাপ্রসাদের বিশ্বাস অটুট থাকে খোকার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। খোকার মৃত্যুর পর তার ভুল ভাঙে এবং পিতৃভক্ত তারাপ্রসাদ দয়াময়ীকেই তার ছেলের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তাকে দেবী থেকে রাক্ষসীতে নামিয়ে আনেন –

> “যখন খোকার মৃত্যু সংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইল তখন তারাপ্রসাদ অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিল – দয়াময়ীকে বলিল – “রাক্ষসী খোকাকে নিলি? কিছুতেই মায়া ত্যাগ করতে পারলি নে?”[১৩]

পুরুষতান্ত্রিকতা ও ধর্মান্ধতার প্রতিভূ কালীকিঙ্কর, আর এই অর্থে তাঁর বড় ছেলে তারাপ্রসাদ তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও লিঙ্গ অবদমনের ধারক ও বাহক। তাই তার পক্ষে নারীর নারীত্বকে অস্বীকার করে তাকে দেবীত্বে উন্নীত করা বা রাক্ষসীতে অবনমিত করা অত্যন্ত সহজ যা বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের পুরুষতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটি। পুরুষতান্ত্রিকতার বশবর্তী হলেই নারী হয়ে যায় দেবী, “The Angel in the House”[১৪]; আর তা না হলেই সে হয়ে যায় রাক্ষসী বা “The Madwoman in the Attic”[১৫] যার অন্তিম পরিণতি হত্যা, আত্মহত্যা, পরিবারে ভাঙন ও অপূরণীয় ট্রাজেডি। দয়ামযীর ভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে এর থেকে আলাদা কিছু হয়নি। তাই তাকে আত্মহত্যা করেই নিজেকে খোকার মৃত্যুর দায় থেকে বাঁচতে হয়। অথচ খোকার মৃত্যু বা দয়ার আত্মহত্যা দুটোই আসলে হত্যা, অপরাধী পুরুষতান্ত্রিকতা, ধর্মান্ধতা ও গোড়াঁমি। তবু এসবের দায় পুরুষকে দেওয়া হয়না। বিচার হয় নিস্পাপ, নিষ্কলুষ ও আসহায় কিছু প্রাণ। এখানেই এ বাংলার সমাজ জীবনের ট্রাজেডি যার নিদারুণ বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে এই গল্পে।

পরিবারের আরেক পুরুষ, উমাপ্রসাদ, তার বাবা ও দাদার থেকে কিছুটা আলাদা। সে যুক্তিবাদী, শিক্ষিত এবং কিছুটা প্রতিবাদীও। ধর্মের প্রতি, বলা ভালো ধর্মান্ধতার প্রতি, তার কোনই বিশ্বাস নেই। লেখক প্রভাতকুমার গল্পের শুরুতেই সেটি পরিস্কার করেছেন –

> “অতবড় শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ যে পর্যন্ত একদিনও স্ত্রীর নিকট মূদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকন্যাসের কোনো প্রসঙ্গ উথাপন করে নাই এবং যমনিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়াছিল।”[১৬]

‘মূদ্রাপ্রকরণ’ শব্দটি যোগসাধনার মাধ্যমে ঈশ্বর উপাসনার সাথে যুক্ত। ‘মাতৃকন্যাস’ শব্দটি নারীকে দেবীরূপে কল্পনা করে পূজা ও আড়ম্বরের অর্থবহ। ‘যমনিয়মাদি’ শব্দটিও যোগসাধনার অঙ্গ এবং এটি ব্যবহৃত হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্কে আত্মসংযমের চর্চা প্রসঙ্গে। ‘সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে’ শুরু করা কুড়ি বছর বয়সী উমাপ্রসাদ এসবেই অবিশ্বাসী ও প্রতিবাদী। তাই কালীকিঙ্কর যখন স্বপ্নাদেশের কথা বলে দয়াময়ীকে “দেখিতে পাইবামাত্র নিকটবর্তী হইয়া তাহার পদতলে সাস্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন,” উমাপ্রসাদ প্রথমে ‘বিস্ময়ে বাক্যহীন’ হয়ে পড়ে এবং কালীকিঙ্করকে ‘উন্মাদ’ বলতেও দ্বিধা করেনা।[১৭] দয়াময়ীর নিজের অবিশ্বাসের কথা জানার পর উমাপ্রসাদ ঠিক করে তাকে নিয়ে সে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে। দেবীর চরণামৃত খেয়ে আরোগ্য লাভের দুটি ঘটনার পর দয়াময়ীর নিজের দেবীত্বে বিশ্বাস জন্মালে এবং তার স্বামীর অকল্যাণ হওয়ার ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার সিধান্ত থেকে সে অব্যাহতি পেতে চাইলে উমাপ্রসাদ ‘যেন বজ্রাহত হইল’ এবং তাকেও জিজ্ঞেস করে “দয়া, তুমিও পাগল হলে?”[১৮] দয়ামযীকে বোঝানোর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে যে রাগ করে আর বাড়িও ফেরে না। বিবাগী হয়ে গৃহত্যাগ করেই সে এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জানায়।

কিন্তু পরিবারের এক পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তার এই প্রতিবাদ যথেষ্ট নয়, এতে কারোরই কোন লাভ হয়না। সে বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত ও যুক্তিবাদী হয়েও তার প্রতিবাদের একটা সীমাবদ্ধতা রয়ে যায়। জমিদার বাবাকে মুখের ওপর উন্মাদ বললেও তার পৌরুষের সাহস হয়নি যে সে যুক্তি দিয়ে তার বাবার অন্ধবিশ্বাস ভাঙবে এবং তার পরিবারকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। সে হয়তো জানতো যে ধর্মান্ধতা কোন যুক্তির ধার ধারে না। আর তাই সেই প্রচেষ্টার নিস্ফলতা সমন্ধে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তা বলে চোরের মত দেবী কল্পিত দয়াময়ীর জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া ঘরে ঢোকা এবং চুপিসারে পালিয়ে যাওয়ার সিধান্ত তার মতো যুক্তিবাদী মানুষের জন্য মানানসই নয়। লেখক-বক্তাও সূক্ষ্মভাবে এর প্রতিবাদ করেন যখন বারংবার উমাপ্রসাদের চুপিসারে দয়াময়ীর ঘরে ঢোকাকে চোরের মত কাজ বলে বিদ্রূপ করেন -

- অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে দুয়ার খুলিতে লাগিল। চোরের মত সন্তর্পণে উমাপ্রসাদ প্রবেশ করিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল দিল।[১৯]
- রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত। চোরের মত উমাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।[২০]

এমনকি দয়াময়ীকে বুঝিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় তার অন্তিম ব্যর্থতাও তার শিক্ষা ও যুক্তিবোধের অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতারই পরিচায়ক। এমনকি এক পুরুষের যুক্তিবাদীতা ও শিক্ষা অন্য পুরুষের অন্ধবিশ্বাস ও অযুক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মোকাবিলা করতে অক্ষম।

ধর্মের পুরুষতান্ত্রিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে পুরুষেরই অক্ষমতা দেখানোর সাথে সাথে প্রভাতকুমার নারীর প্রতিবাদের দিকটিও তুলে ধরেছেন যা সেই যুগে প্রায় অকল্পনীয় ছিল। মেয়েদের প্রতিবাদের ক্ষমতাও সীমিত হলেও তা যে এই গল্পের পুরুষ চরিত্রদের থেকে ধারে ও ভারে বেশি ছিল তা প্রভাতকুমার এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন। স্বপ্নাদেশের মত কুসংস্কারে, অন্ধবিশ্বাসের প্রতি অবিশ্বাসে, অযুক্তি বা কুযুক্তির প্রতিবাদে, এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অপূরণীয় ক্ষতি ও বিপদের নিরুচ্চার বা সোচ্চার প্রতিবাদে নারীরাই এই গল্পে প্রকৃত প্রতিবাদী হয়ে ধরা দিয়েছে, যা বাঙালী নারীর প্রগতিশীলতা, মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদীতাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। বাংলার তথাকথিত অশিক্ষিত ও অবদমিত মেয়েদের এই নারীবাদী পদক্ষেপ উনিশ শতকীয় বাংলার যুগ-সংস্কৃতি বিরুদ্ধ ও অগ্রগামী যা প্রভাতকুমারের সাহসিকতা ও সময়ের থেকে এগিয়ে থাকার মানসিকতাকে প্রকাশ করে।

কালীকিঙ্করের স্বপ্নাদেশের প্রথম প্রকাশের পর উমাপ্রসাদের পাশাপাশি দয়াময়ীও প্রতিবাদ জানায় যদিও তা উমাপ্রসাদের মত সোচ্চার না হলেও নীরব। তার কারণও অনেক। প্রথমত, সে ষোড়োশবর্ষীয়, এবং বয়সজনিত কারণেই সোচ্চার প্রতিবাদ করার মত তার পরিণতমনস্কতার অভাব। দ্বিতীয়ত, খুব বেশি সময় হয়নি সে শ্বশুরবাড়ি এসেছে, মাত্র পাঁচ-ছয় বছর, যা জমিদারের পরিবারে কর্তৃত্ব স্থাপন বা স্বরোৎক্ষেপনের পক্ষে এক সহায়সম্বলহীন মেয়ের পক্ষে একেবারেই যথেষ্ট নয়। তৃতীয়ত, পরিণতমনস্কতা বা সাংসারিক অভিজ্ঞতা থাকলেও তা তার গণ্যমান্য ও প্রতাপশালী জমিদার শ্বশুরের পৌরুষ ও প্রতাপকে অস্বীকার করার সাহস করে না। চতুর্থ কারণ হল ঘটনার আকস্মিকতা উমাপ্রসাদের মত তাকেও বাকরুদ্ধ করে দেয় –

> “দয়ামযী শ্বশুরের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।”[২১]

তার প্রতবাদের নীরব প্রকাশ তার কান্নায় এবং নিজের দেবীত্ব অস্বীকারের মত নিজের সত্ত্বাকেও অস্বীকার করতে চাওয়ায়-

> “কিন্তু এই তিনদিন দেবীর পূজা পাইয়াও দয়াময়ী কেবল কাঁদিতেছে। আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়। এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনায় তাহাকে এমন অভিভূক্ত বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে ... যাহার তাহার পানে শূন্য দৃষ্টিতে পাগলিনীর মত চাহিয়া থাকে। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন হইয়াছে, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে, বেশবাস সুসম্মত নহে।”[২২]

কিন্তু তার প্রতিবাদ শুধুমাত্র নীরব ছিল না। মানবী দয়াময়ী যখন “সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল”[২৩] তখন থেকেই তাকে তার স্বামী উমাপ্রসাদের থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়। তখন তার আশ্রয় হয় বাড়ীর বড় বউ, হরসুন্দরী, তার জা। ঘটনার

প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে তার দেবীত্ব মেনে না নেওয়ার ও শ্বশুরের স্বপ্নাদেশ অস্বীকার করার সরব প্রকাশ ঘটে হরসুন্দরীর কাছেই –

> “প্রথম দুই চারি দিন তাই বড় বধূই দয়াময়ীর জুড়াবার ঠাঁই হইয়াছিলেন। প্রথম যখন স্বয়ং দয়াময়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে সে দেবী, তখন সে একদিন বড়বধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল – “দিদি আমার এ কি হল?”[২৪]

তিনদিন পর যখন উমাপ্রসাদ তার ঘরে গোপনে আসে এবং জানতে চায় যে দয়াময়ী এসবে বিশ্বাস করে কিনা, তখন দয়াময়ীর প্রতিবাদ তার স্বামীর কাছে আরও সরব হয়ে ওঠে –

> “এইবার দয়া কথা কহিল – বলিল - “না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই। আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছু নই – আমি দেবী নই – আমি কালী নই।”[২৫]

আশ্বস্ত উমাপ্রসাদ যখন মুক্তিস্বরূপ বাড়ী থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়, দয়াময়ীও তাতে সাগ্রহে রাজী হয়ে, অধীর ও জোরালো ভাবে মুক্তি প্রত্যাশা করে -

> দয়া বলিল -- “তাই চল। কিন্তু কি উপায়ে যাবে?”
>
> উমাপ্রসাদ বলিল -- “সে সমস্ত আমি ঠিক করব, কিছু সময় যাবে।”
>
> দয়া বলিল -- “কবে? কবে? শীগগির ঠিক কর -- নইলে বেশী দিন আমি বাঁচব না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাব।”[২৬]

কিন্তু দয়ার সরব প্রতিবাদ দুটি ঘটনায় একেবারে স্তিমিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সেই ঘটনা দুটির প্রেক্ষিতে ও উমাপ্রসাদের ভাবী অকল্যাণের আশঙ্কায় শ্বশুরের স্বপ্নাদেশে তথা নিজের দেবীত্বে তার প্রাথমিক অবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসের কাছে এবং তার যুক্তি অযৌক্তিকতার কাছে পদর্যুস্ত হয়। একটি মরণাপন্ন শিশু যাকে কবিরাজও জবাব দিয়েছেন, তার চরণামৃত খেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠা এবং তিনদিন ধরে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর ও মরণোন্মুখ এক প্রসূতির “চরণামৃত পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মত সুন্দর সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব” করার পর দয়াময়ীর নিজের দেবীত্বে অবিশ্বাস টলে যায়। ফলস্বরূপ যেদিন রাতে উমাপ্রসাদ তাকে নিয়ে পালানোর জন্য তার কাছে যায় সেদিন তার দেবীত্বে বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের প্রতি যুক্তি উমাপ্রসাদকে হতাশ করে -

> দয়া সহাসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল - তুমি আর স্ত্রীভাবে আমাকে স্পর্শ কোর না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তমার স্ত্রী তা আর আমি নিশ্চয় করে বলতে পারিনে।
>
> কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া ছিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুমবন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দয়াময়ী সহসা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া দূরে বসিল। বলিল – “না না, হয়ত তোমার অকল্যাণ হবে।”
>
> এ কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজ্রাহত হইল। বলিল – “দয়া, তুমিও পাগল হলে?”
>
> দয়া বলিল - “তবে এত লোকের রোগ আরাম হল কেন? তা হলে কি দেশসুদ্ধ লোক পাগল?” উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল। অনেক অনুনয় করিল। অনেক কাঁদিল। দয়াময়ীর মুখে কেবল সেই কথা -- “না না, তোমার অকল্যাণ হবে। হয়ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয়ত আমি দেবী।”[২৭]

উমাপ্রসাদ আবার বোঝানোর চেষ্টা করে এবং সাময়িক সাফল্যস্বরূপ দয়াময়ীও পালাতে রাজী হয়, যদিও তার নিজের দেবীত্ব আর তার সাথে তার স্বামীর দেবত্বও স্বীকার করে। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্যের আগেই, দয়াময়ী দৃঢ়ভাবে পলায়ন আস্বীকার করে এবং তার দেবীত্বে ফিরে যায়, কিন্তু একাই -

> কিন্তু কিছুদূর চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, “আমি যাব না।” এবার স্বর অত্যন্ত দৃঢ়। উমাপ্রসাদ আবার অনুনয়ের সাধ্যসাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। দয়া বলিল, “আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এক জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।” উমাপ্রসাদ

> মর্মাহত হইয়া বলিল - "তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাব না।" তাহাই হইল। দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল।[২৮]

দয়াময়ীর নারীসত্ত্বা দেবীত্বের কাছে হার মানে, তার একক ও ব্যক্তিগত অধিকার সমষ্টির কাছে মাথা নোয়ায় এবং তার মৌলিক ভাবনা ও বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিকতা ও পরিস্থিতির শিকার হয়। স্বামীর মঙ্গল কামনায় বাঙালি নারী নিজের জীবনের অমঙ্গল ও অন্তিম পরিণতি স্বীকার করে নেয়, করতে বাধ্য হয়। দয়ামযী তাদেরই প্রতিনিধি।

কালীকিঙ্করের স্বপ্নাদেশ ও তৎজনিত ধর্মান্ধতার সবচেয়ে সরব প্রতিবাদী স্বর কোনো পুরুষ নয়, এক নারী – তারাপ্রসাদের স্ত্রী, হরসুন্দরী –

> "দয়াময়ীর দেবীত্বে সকলেই বিশ্বাসবান, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহার বড়বধূ হরসুন্দরী – খোকার মা।"[২৯]

সে জমিদার পরিবারের পুরুষতান্ত্রিকতার গণ্ডীর মধ্যে থেকেও পুরুষ-প্রভাব মুক্ত এবং সমগ্র গল্পে সে প্রতিভাত এক অনন্য নারী হিসেবে তার নিজস্ব, মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তাধারা ও তা প্রকাশের মাধ্যমে। কিন্তু শুধু মৌখিক প্রতিবাদ নয়, হরসুন্দরী তার কাজেও শ্বশুর ও স্বামীর গোঁড়ামির প্রতিবাদী। হয়ত তার ডাকেই "বৈদ্য আসিল, কিন্তু কালীকিঙ্কর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন – "আমার বাড়ীতে স্বয়ং মার অধিষ্ঠান, কত কত দুঃসাধ্য রোগ মার চরণামৃত পান করে ভাল হয়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে রোগ হলে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করবে?"[৩০] শ্বশুরের এই অগাধ বিশ্বাসে অবদমিত না হয়ে হরসুন্দরী নিজের চেষ্টার তিব্রতা বাড়ায় এবং "নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন–

> "ওগো ছেলেকে বদ্দি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচবে না। ও রাক্কুসি ডাইনি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না। ওর কি সাধ্যি!""[৩১]

পিতৃভক্ত ও পিতার বিশ্বাসে অন্ধ, নিজস্বতাহীন তারাপ্রসাদ স্ত্রী কে খোকার চিকিৎসার জন্য তার বাবার বিশ্বাসের ওপর এবং দায়াময়ীরুপী দেবী কালীর ওপরেই খোকার মঙ্গল তথা আরোগ্য প্রত্যাশা করে হরসুন্দরীকে ডাক্তার ডাকা থেকে নিরত করে। কিন্তু হরসুন্দরী আবার ঘোরতর প্রতিবাদ করে এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপ শ্বশুর ও স্বামীর বিরুদ্ধে যেতে ভয় না পেয়ে সে কালীকিঙ্করকে পরোক্ষভাবে হলেও একপ্রকার বাধ্য করে খোকার চিকিৎসার ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্যঃ "কিন্তু বড়বধূর প্রতিদিনকার কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দনে কর্তা একদিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন –

> "মা, খোকার যে ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে কি?"[৩২]

দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দয়াময়ীর "আমিই ওকে ভাল করে দেব"[৩৩] আশ্বাস সত্ত্বেও এবং সেই আশ্বাসে শ্বশুর ও স্বামীর বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হরসুন্দরী "একদিন একটি বিশ্বস্ত ঝিকে কবিরাজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন – যাহা কিছু রোগের বিবরণ সব বলিয়া দিলেন। ঔষধ চায়।"[৩৪]

কালীকিঙ্করের স্বপ্নাদেশের প্রতি সার্বিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে হরসুন্দরীর প্রতিবাদ একক এবং সবচেয়ে সাহসী - "যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই খোকার মা কাঁদিয়া বলেন – "ওগো কিছু ওষুধ বলে দাও, আমার ছেলে বাঁচে না।" সকলেই বলে – "ওমা ও কথা বোলোনা, তোমার ভাবনা কি? তোমার ঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি বিরাজ করছেন।"[৩৫]

এমন নয় যে খোকার অসুস্থতা বৃদ্ধির পর থেকে হরসুন্দরী তার শ্বশুর ও স্বামীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও অলৌকিকে অবিশ্বাসী। স্বপ্নাদেশের খবর জানার পর থেকেই সে তার প্রতিবাদে সরব। তাই দয়ামযী যখন তার কাছে গিয়ে তার দুর্গতির অভিযোগ জানায়, হরসুন্দরীও উমাপ্রসাদের মতোই কালীকিঙ্করকে পাগল আখ্যা দেয় এবং তাঁর স্বপ্নাদেশের প্রতি তীব্র অনাস্থা প্রকাশ করে দয়ামযীকে বলে, -

> "কি করবো বোন ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।"[৩৬]

এ কথা ঠিক যে হরসুন্দরী প্রত্যক্ষভাবে বা নিজের মুখে কালীকিঙ্করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না, কিন্তু যেখানে কালীকিঙ্করের দুই ছেলেই বাবার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস প্রায় রাখেইনা, সেখানে বাড়ির বউ হিসেবে কালীকিঙ্করের সাথে হরসুন্দরীর প্রত্যক্ষ বিবাদ অনাকাঙ্খিত দুঃসাহসের নামান্তর যাকে কোনোভাবেই কালীকিঙ্করের অহং মান্যতা দেবেনা। তাছাড়া, গোটা গল্পেই কালীকিঙ্করের সাথে হরসুন্দরীর কোনোরকম প্রত্যক্ষ কথোপকথন লেখক উপস্থাপনও করেননি। এটি ইঙ্গিত দেয়

শ্বশুরের সংস্কারের বিরুদ্ধে হরসুন্দরীর আগাগোড়া অবিশ্বাস ও প্রতিবাদ এবং সেই কারণে তার সাথে শ্বশুরের প্রত্যক্ষ বাক্য বিনিময়ের অভাব। হয়তো এই কারণেই কালীকিঙ্কর কূলদেবীর পূজার ভার সবটাই অর্পণ করেছিলেন দয়াময়ীর ওপর –

> "যদিও বাটীতে দাসদাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহকার্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষত তাহার শ্বশুরের পূজাহ্নিক সম্পর্কীয় যাহা কিছু কার্য্য তাহাতে দয়া ছাড়া কাহারও হস্তস্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না।"[৩৭]

উপরোক্ত লেখকীয় মন্তব্য কালীকিঙ্করের হরসুন্দরীর প্রতি রুষ্টতা এবং দয়াময়ীর প্রতি অতিশয় তুষ্টতা প্রকাশ করে। দুই পুত্রবধূর প্রতি তাঁর এই বিষম আচরণ নারী সম্বন্ধে পুরুষতান্ত্রিক দ্বিমাত্রিকতারই পরিচয় বহন করে – পুরুষতান্ত্রিকতাকে অমান্য করা প্রতিবাদী নারী হল রাক্ষুসী এবং তাকে স্বীকার করা ও সেইরূপ কর্ম করা নারী হল দেবী। প্রথম জন "The madwoman in the attic" এবং অন্যজন "The Angel in the House"। তাই এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় যে পাঁচ-ছয় বছর ধরে দয়াময়ীর মুখ বুজে মেনে নেওয়াতে ও কাজেকর্মে কালীকিঙ্করের অহং তুষ্ট এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি দয়াময়ীকেই 'angel' বা দেবীর অবতার হিসেবে দেখতে চাইবেন এবং হয়তো সেটাই তাঁর মনের সুপ্ত ইচ্ছা যা তাঁর স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্ন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করেনা, স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের অবচেতন বা অচেতন মনের গোপন ইচ্ছা বা অতীত জীবন প্রকাশিত হয় -

> "And the value of dreams for giving us knowledge of the future? There is of course no question of that ... It would be truer to say instead that they give us knowledge of the past. For dreams are derived from the past in every sense. Nevertheless the ancient belief that dreams foretell the future is not wholly devoid of truth. By picturing our wishes as fulfilled, dreams are after all leading us into the future. But this future, which the dreamer pictures as the present, has been moulded by his indestructible wish into a perfect likeness of the past."[৩৮]

কালীকিঙ্করের অবচেতন মনের এই সুপ্ত ইচ্ছাই হয়তো তাঁর শক্তি উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার এবং তাঁর কর্তৃত্বকে আরো অধিষ্ঠিত করার অপ্রকাশিত বাসনা থেকে উদ্ভূত। মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিচার করলে এটাই স্বাভাবিক যে সর্বদা ক্ষমতাভোগী, শাক্ত উপাসনায় নিমগ্ন ও দেবী কালীর দর্শন প্রত্যাশী এবং মনে মনে দয়াময়ীকে দেবী হিসেবে দেখার অভীপ্সাই কালীকিঙ্করের কাছে স্বপ্নাদেশ রূপে প্রকাশ পায়। তাই এই স্বপ্নাদেশ আপাতভাবে অলৌকিক এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও তা ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্বিক দিক থেকেও ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু স্বপ্নের মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ফ্রয়েডের বই 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০ খ্রিঃ) এই গল্পের প্রকাশকালের আগে প্রকাশিত হয়নি। প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পটি প্রকাশ পায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। তাই স্বপ্নের মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা তাঁর জানার কাথা নয়, এই গল্পের চরিত্রদের তো নয়ই; যেহেতু এই গল্পের পটভূমি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি। প্রভাতকুমারের গল্পে স্বপ্নের উল্লেখ একবার মাত্র হলেও এবং তার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত গল্পে না থাকলেও, গল্পের চরিত্রের মাধ্যমে, বিশেষ করে মহিলা চরিত্রের মাধ্যমে, তিনি স্বপ্নের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দিকটির সমালোচনা করেছেন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বপ্নের বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন যা সেই সময়ের স্বপ্ন দর্শনের আঙ্গিকে অভিনব এক প্রয়াস। এর তাৎপর্য আরও গভীর হয় যখন গল্পটি ফ্রয়েডের বই প্রকাশের আগে প্রকাশিত। সেই দিক থেকে প্রভাতকুমারের এই গল্প স্বপ্নের দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার সংস্কৃতিতে তো অবশ্যই, সম্ভবত সমগ্র বিশ্বেই পথপ্রদর্শক। বিশ্ব সাহিত্যে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে স্বপ্নের দৈবিক ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে যে কতিপয় সাহিত্য রচনা হয়েছে তাতে প্রভাতকুমারের এই গল্প অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতির অন্যতম পরিচায়ক তাদের সাহিত্য। ম্যাকলে তো ইংরেজি সাহিত্য ভিন্ন অন্য সাহিত্যকে সাহিত্য বলেই গণ্য করেননি -

> "The claims of our own language it is hardly necessary to recapitulate. It stands pre-eminent even among the languages of the West ... It may safely be said, that the literature now extant in that language is of far greater value than all the literature which

> three hundred years ago was extant in all the languages of the world together ... Whether we look at the intrinsic value of our literature, or at the particular situation of this country, we shall see the strongest reason to think that, of all foreign tongues, the English tongue is that which would be the most useful to our native subjects ... The literature of England is now more valuable than that of classical antiquity. I doubt whether the Sanscrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors. In some departments, — in history, for example, I am certain that it is much less so.”[৩৯]

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাতকুমারের ‘দেবী’ গল্পের এবং তাতে স্বপ্নের উপস্থাপনের গুরুত্ব আরও অপরিসীম, আরও গভীর। তাঁর এই গল্পটি উত্তরৌপনিবেশিক ও নারীবাদ উভয় দিক থেকেই অনেকটা ‘empire writing back’ এর মতো। এক্ষেত্রে ‘empire writing first’ বললেও হয়তো অত্যুক্তি হয়না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্বপ্নের উপস্থাপনের উপস্থিতি যথেষ্ট বেশি। স্বপ্নের অলৌকিক ব্যাখ্যার প্রভাবই ছিল বেশি এবং অলৌকিক স্বপ্ন বা স্বপ্নের দৈবিক তাৎপর্যকে ইংল্যান্ডের তদানীন্তন শিক্ষিত, উচ্চবর্গীয় ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অযৌক্তিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে বর্জন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা স্বপ্নের মধ্যে কোন অর্থ বের করাকেই নিরর্থক মনে করতেন এবং তৎকালীন ইংল্যান্ডের মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু বইয়ের ধারণা অনুযায়ী মনে করতেন স্বপ্ন শারীরিক ও মানসিক রোগের প্রকাশ এবং একমাত্র দুর্বল মনের মানুষ বা মেয়েরাই স্বপ্ন দেখে, যে ধারণার বিরোধিতা করেছিলেন ফ্রয়েড স্বয়ং তাঁর বইতে।

অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের নারী সমাজ পুরুষতান্ত্রিক যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে স্বপ্নকে ভবিষ্যৎ এর ইঙ্গিতবহ এবং দৈবিক বার্তা প্রেরক বলে মনে করলেন। অর্থাৎ, মহিলা সমাজ এবং দৈবিক স্বপ্নকে একপ্রকার সমার্থক করে দেওয়া হল। মহিলারা, বিশেষত অবিবাহিত মহিলারা, স্বপ্নের দৈবিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার একটি সংস্কৃতি তৈরি করলেন এবং তা এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ইংল্যান্ডের বাজারে স্বপ্নের অপর লেখা স্বস্তা বইয়ের জনপ্রিয়তা ও বিক্রি দুইই চরম আকার নেয়। এই বইগুলি স্বপ্ন-পুস্তিকা বা Dream Books নামে পরিচিত ছিল। এই বইগুলিতে মূলত মহিলাদের স্বপ্নে দেখা বিভিন্ন জিনিষ বা ঘটনাকে তাদের, বিশেষত অবিবাহিত মেয়েদের, ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিতবাহক রুপক হিসেবে ব্যাখ্যা করা থাকতো। মজার বিষয় হল, এই সমস্ত বইয়ের লেখক ছিল মুলত পুরুষ যারা Mother Bunch, Mother Bridget, Mother Shipton, এই ধরণের কিছু কল্পিত নারীর নামে বইগুলি প্রকাশ করতেন।

শুধু সস্তার পথ-পুস্তিকাতেই দৈবিক বা অলৌকিক স্বপ্নের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, ইংল্যান্ডের মূলধারার সাহিত্যেও এর প্রভাব ছিল বিস্তর। এর অন্যতম চর্চাকারী সাহিত্যিক ছিলেন Rhoda Broughton (১৮৪০-১৯২০), উনিশ শতকের শেষভাগের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় মহিলা ঔপন্যাসিক ও রহস্য গল্প লেখিকা। তাঁর রহস্য গল্পের সংকলন, ‘Tales for Christmas Eve’ (১৮৭২ খ্রিঃ) - এর বেশ কিছু গল্পে তিনি দৈবিক স্বপ্নেকে উপস্থাপিত করেছেন ইতিবাচক দিক থেকে, এক্ষেত্রে ‘The Man with the Nose’, ‘Behold, It Was a Dream!’ এবং ‘Poor Pretty Bobby’ ছোটগল্পগুলি দ্রষ্টব্য, সমস্ত গল্পেই Broughton দেখিয়েছেন যে মেয়েদের দৈবিক স্বপ্নকে উপেক্ষা করার ফলেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও পরিবারে ভাঙন বা বিপদ নেমে আসে।

তাঁর উপরোক্ত গল্পসঙ্কলনের প্রায় সমস্ত গল্পেই দেখানো হয়েছে যে পুরুষ চরিত্ররা, তারা স্বামী হোক বা বাবা, যারা তদানীন্তন ইংল্যান্ডের পুরুষতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী সমাজের প্রতিভূ, তারা দৈবিক স্বপ্নের বিরোধী এবং মেয়েদের অলউকিক স্বপ্নকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করেছে এবং ফলস্বরূপ পরিবারে ট্রাজেডি নেমে এসেছে। প্রভাতকুমারের ‘দেবী’ গল্পটি ঠিক এর বিপরীত ছবি তুলে ধরে। তাঁর গল্পে এক পুরুষ দৈবিক স্বপ্ন দেখে এবং নারীরা তার প্রতিবাদ করে। সুতরাং, সেই সময়ে যেখানে ইংল্যান্ডের নারীরা স্বপ্নের অযৌক্তিক দিকটিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, সেখানে প্রভাতকুমার তাঁর ‘দেবী’ গল্পে দৈবিক স্বপ্নের কুসংস্কার ও তৎজনিত ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে নারী চরিত্রদের বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে ও তাঁর গল্পে এই পরস্পরবিরোধী উপস্থাপন প্রায় সমসাময়িক। এই দিক থেকে বলা যেতেই পারে যে প্রভাতকুমার তাঁর সময়ের থেকেই শুধু অনেক এগিয়ে ছিলেন না, বরং নারী উন্নয়নে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল মুক্ত ও কুসংস্কারবিহীন, এবং যুক্তি, বৈজ্ঞানিকতা ও নারীবাদের নিরিখে তাঁর বাংলা গল্প, বিশেষত

'দেবী', ইংরেজি সাহিত্যের থেকেও অগ্রগামি। সম্ভবত এই বিশেষ গুণগুলির জন্য এবং স্বপ্নের দৈবিকতার প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করে, স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রভাতকুমারের এই গল্পটির চলচ্চিত্রায়ণ করেন। স্বপ্নাদেশ নিয়ে বাংলার কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির চর্চা যে বিংশ শতকের ষাটের দশকেও ছিল তা আরও ষাট বছর পর একবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে আজকের দিনেও বাংলার জনমানসে স্বপ্ন নিয়ে সংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক ভাবনা ও আলোচনায় কর্ণপাত করলেই বোঝা যায়।

Reference:

১. Macnish, Robert. The Philosophy of Sleep. W. R. M'PHUN, 1836. P. 53

২. Dickerson, Vanessa D. Victorian Ghosts in the Noontide: Women Writers and the Supernatural. U of Missouri P, 1996. P. 31

৩. Brecke, Anna J. Widening the Sphere : Mid-to-Late Victorian Popular Fiction, Gender Representation and Canonicity. Diss. University of Rhode Island, 2018. ProQuest. Web. 15 Jan. 2022. P. 112

৪. তদেব, P. 121-22

৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *গল্পসমগ্র.* কলকাতা: যূথিকা বুক স্টল, পৃ. ২৮৯

৬. তদেব

৭. তদেব, পৃ. ২৯২

৮. তদেব

৯. তদেব, পৃ. ২৯৪

১০. তদেব, পৃ. ২৯৬

১১. তদেব

১২. তদেব

১৩. তদেব, পৃ. ২৯৬-৯৭

১৪. Patmore, Coventry. "The Angel in the House," edited by Henry Morley, 2001. Ebook. https://www.gutenberg.org/files/4099/4099-h/4099-**h**.htm

১৫. Gilbert, Sandra M. and Susan Guber. *The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination*. London : Yale University Press, 1984

১৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *গল্পসমগ্র.* কলকাতা: যূথিকা বুক স্টল, পৃ. ২৮৯

১৭. তদেব, পৃ. ২৯২

১৮. তদেব, পৃ. ২৯৫

১৯. তদেব, পৃ. ২৯২

২০. তদেব, পৃ. ২৯৪

২১. তদেব, পৃ. ২৯২

২২. তদেব, পৃ. ২৯২

২৩. তদেব, পৃ. ২৯২

২৪. তদেব, পৃ. ২৯৬

২৫. তদেব, পৃ. ২৯৩

২৬. তদেব, পৃ. ২৯৩

২৭. তদেব, পৃ. ২৯৫

২৮. তদেব, পৃ. ২৯৫-৯৬

২৯. তদেব, পৃ. ২৯৬

৩০. তদেব

৩১. তদেব

৩২. তদেব

৩৩. তদেব

৩৪. তদেব

৩৫. তদেব

৩৬. তদেব

৩৭. তদেব, পৃ. ২৯০

৩৮. Freud, Sigmund. The Interpretation of Dreams. Translated and edited by James Strachey, Basic Books, 2010. P. 615

৩৯. Macaulay, T.B. “Macaulay’s Minute in Education”, 1835, pp. 3-5. https://ia802800.us.archive.org/18/items/dli.csl.5518/5518.pdf.